Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.137-139
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ফজিলাতুন্নেসা জোহা: নারী মুক্তি আন্দোলনের এক বিস্মৃত মহীয়সী

দেবশ্রী মুখার্জী

Abstract:

*Reawaking of Women of the Hindu Community while starting from early part of the 19th Century, that of the Muslim Community was noticed in the last part of the 19th Century and beginning of the **20**th Century. The standard bearer of the education of Muslim women was Begum Rokeya which was later carried forward by Fazillatunnessa Zoha. In her effort the spread of education to the muslim women, became visible to us to a great extent , when Fazillatunessa got admission in M.A. in Dacca University, she got no hostel facilities of that University and had to stay in a rented house away from the University. She completed her M.A. Degree in 1927. Thereafter, muslim women's education was spreading fast and people took notice. This led to rapid increase of muslim women students in Dacca University, and a separate hostel for women students had to be set up. During her study in the university the activities of the liberal 'Sikha' group influenced her greatly. By her effort and initiative Eden Intermediate College was upgraded to Degree College. Not with standing all such developments the progressive section of the muslims did not succeed in achieving fully women liberation. The reasons thereof can be traced to the hesitancy of the Muslim to come out of Islamic inhibition, rendering them incapable of accepting progressive ideas of Fazillatunessa. Thus we find that she had to live the last four decades of 20th Century as an exceptionally lonely and estranged person.*

বিংশ শতকের দুই এবং তিনের দশকে বাংলার মেয়েরা উচ্চশিক্ষা, কর্মজীবন ও বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। হিন্দু সমাজে নারী জাগরণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। হিন্দু সমাজে নারী জাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষলগ্ন থেকে শুরু হলেও মুসলমান সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তা লক্ষ্য করা যায়। বাঙালী হিন্দু সমাজে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু যে পথ তৈরি করেছিলেন, সেই পথকে অবলম্বন করেই বহু মহিলা তাদের লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তুলনামূলকভাবে বাংলার মুসলীম সমাজে মহিলাদের সংখ্যা সেক্ষেত্রে কিছুটা কম হলেও শিক্ষা দীক্ষা বা কর্মজীবনে তাদের অংশগ্রহণের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া নিজেই একটি পর্বের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু বেগম রোকেয়াতেই বাংলার মুসলীম নারী সমাজের অগ্রগতি থেমে থাকেনি। পরবর্তীকালে অগ্রগতির এই পতাকাকে যিনি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার নাম ফজিলাতুন্নেসা।

ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন বেথুন কলেজের প্রথম মুসলীম ছাত্রী। ১৯০৫ সালে পূর্ববাংলার টাঙ্গাইল জেলার করোটিয়ার গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। করটিয়ার জমিদার বাড়িতে স্বল্প বেতনে কর্মরত স্বল্প শিক্ষিত পিতা আব্দুল ওয়াজেদ খানের কন্যা ফজিলাতুন্নেসার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামে শুরু হলেও কন্যার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পেয়ে পিতা আব্দুল ওয়াজেদ ফজিলাতুন্নেসাকে ঢাকা শহরে নিয়ে এসে ইডেন গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কন্যা ফজিলাতুন্নেসার প্রতি পিতা আব্দুল ওয়াজেদের এই পদক্ষেপ তৎকালীন গোঁড়া পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের মধ্যে নিঃসন্দেহে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। পিতার এই উদার মানসিকতার প্রভাব পরবর্তীকালে ফজিলাতুন্নেসার উচ্চশিক্ষার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা ইডেন স্কুল থেকে ১৯২১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ইডেন কলেজ থেকেই ১৯২৩ সালে প্রথম মুসলীম মহিলা হিসেবে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি

কলকাতার মহিলা কলেজ বেথুনে ভর্তি হন। বেথুন কলেজে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মেধাবী ছাত্রী ভর্তি হতে পারত। যদিও বেথুনে তখন অভিজাত ও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরাই সংখ্যায় অধিক ছিল। সেক্ষেত্রে ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন বেথুন কলেজের প্রথম মুসলীম ছাত্রী।

বেথুন কলেজে দু-বছর অধ্যয়নের পর ১৯২৫ সালে ডিসটিংশন সহ বি.এ. পাশ করেন। ফজিলাতুন্নেসার এই গৌরদীপ্ত পরীক্ষার ফলাফল বাংলার মুসলীম সমাজের নারীর উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিল। এরপর তার পিতা সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে কন্যা ফজিলাতুন্নেসাকে ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশ্র অংক শাস্ত্রে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি করে দেন। এই সময় যে সকল গুণী মানুষের সান্নিধ্যে ফজিলাতুন্নেসা এসেছিলেন তারা হলেন পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলর তৎকালীন সময়ে ইংরাজীর প্রফেসর ড. হাসান, অংক শাস্ত্রের প্রফেসর ড. এন.এম. বোস, পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং কবি নজরুল ইসলাম। তবে ব্যক্তিগতভাবে ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন অতীব দৃঢ়চেতা প্রকৃতির মহিলা। তাই সব সম্পর্ককেই তিনি একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতেন। ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফজিলাতুন্নেসা মিশ্র গণিতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎকালীন যুগে মুসলীম ছাত্রী হিসেবে তার এই কৃতিত্ব ছিল ঐতিহাসিক। অত্যন্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ ফজিলাতুন্নেসা সমাজের প্রচুর সমালোচনা বিদ্রুপ উপেক্ষা করে বোরখা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। তার ফলস্বরূপ তার উপর ইট পাটকেল ছোঁড়া হত।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'বার্ষিক সওগাত' এর দ্বিতীয় বর্ষের জন্য ফজিলাতুন্নেসা "দু-দিনের দেখা" নামে একটি ছোট গল্প পাঠিয়েছিলেন। সেইসূত্রে পত্রিকার সম্পাদক মোহম্মদ নাসিরুদ্দিনের সাথে তার পরিচয় ছিল। ফজিলাতুন্নেসা নাসিরুদ্দিনকে তার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান। এর সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে এ ব্যাপারে তার মানসিক দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত অন্যকিছু সম্বল নেই। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান মেয়ে বলে তার এই বিলেত যাবার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অনেক সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯২৮ সালে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে ফজিলাতুন্নেসা বিলেত গমন করেছিলেন। বিলেতে থাকাকালীন তৎকালীন ডিরেক্টর অব এডুকেশন খান বাহাদুর আহছাননুল্লাহর পুত্র শামসুজ্জোহার সাথে তার পরিচয় হয়, যা পরবর্তীকালে বিবাহে পরিণতি পায়, যদিও পিতার অসুস্থতার কারণে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই ফজিলাতুন্নেসাকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। যার জন্য তিনি বহু ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যাইহোক ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর ফজিলাতুন্নেসা কিছুকাল রামপুর স্টেট গালর্স স্কুলের অধ্যক্ষা হিসেবে কাজ করেছিলেন, কিন্তু তার প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকা ইডেন স্কুলের শিক্ষকতার মধ্যে দিয়ে। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান ডিভিশনের অ্যাসিসস্টেন্ট স্কুল ইনস্পেকট্রেস হন। এর পরবর্তীকালে বেথুন কলেজে প্রথমে গণিতের অধ্যাপিকা ও পরে বিভাগীয় প্রধান এবং সহ অধ্যক্ষা হিসেবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

ফজিলাতুন্নেসা বেথুনে যে সকল সাবজেক্ট পড়াতেন তার মধ্যে ছিল Hydrostatics, Co-ordinate Geometry and Higher Algebra ইত্যাদি। শিক্ষায়, ব্যক্তিত্বে, পাশ্চাত্য-আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবিত হলেও ফজিলাতুন্নেসার পোশাক ব্যবহারে কখনও অশালীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন ব্যক্তিগতভাবে মোটরগাড়ির ব্যবহার এত প্রচলন ছিল না, সেখানে ফজিলাতুন্নেসা কলেজ আসতেন নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে। ছিলেন টেনিস খেলায় পারদর্শী।

দেশভাগের আগে পর্যন্ত ফজিলাতুন্নেসা বেথুনেই ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ফজিলাতুন্নেসা সরকারী নিয়ম অনুসারে পূর্ব পাকিস্তান (তৎকালীন পূর্ববাংলা) অপশন নিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বেথুন কলেজের সমমানের কলেজ না থাকায় ঢাকার একমাত্র সরকারী ইডেন গালর্স হাইস্কুল ও কলেজে প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন।

ফজিলাতুন্নেসা রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন সময়ে 'বঙ্গলক্ষী' (ফাল্গুন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি বক্তৃতার মাধ্যমে। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি যে মুক্ত বাতাসের আস্বাদ পেয়েছিলেন, তাতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের পরিচয় তার ধর্ম বা জাতের মধ্যে দিয়ে নয়, মানুষ পরিচিতি লাভ করে তার নিজের কর্মের মধ্যে দিয়ে। নারী পুরুষ সমকক্ষ সম্পন্ন এবং সমাজ গঠিত হলে তবেই যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ। তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা 'সওগাত' এর নিয়মিত লেখিকা ছিলেন ফজিলাতুন্নেসা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তার

অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'মুসলীম নারীর মুক্তি'। 'সওগাতের' প্রকাশিত তার এই সকল রচনাই ফজিলাতুন্নেসার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে।

যাইহোক দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ববাংলায় ১৯৫২ এর শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। একদিকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী উত্তেজিত ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা, তাদের দাবী মেটানো, অপরদিকে আন্দোলনকারী ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ব্যর্থতার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিক্ষুব্ধ মনোভাবের সৃষ্টি- এই দুই বিপরীত জাতাকলে পরে ফজিলাতুন্নেসা ১৯৫৬ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে নিজেকে নির্জনে, অন্তরালে সরিয়ে নিয়েছিলেন, এবং ১৯৭৬ সালে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে ফজিলাতুন্নেসার সহকর্মী আখতার ইমাম অনুতপ্ত হৃদয়ে অভিযোগের সাথে লিখেছিলেন যে, ফজিলাতুন্নেসা নারী শিক্ষার সম্প্রসারণের বাংলার ছিলেন অবিচলিত, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ফজিলাতুন্নেসার উদ্যোগে ইডেন ইন্টার-মিডিয়েট কলেজ থেকে ডিগ্রী কলেজে উত্তীর্ণ হয় ও ডিগ্রী কলেজে বিজ্ঞান শাখাও খোলা হয়েছিল। অর্থাৎ যে হাতে কলেজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাকেই অন্যায় অপবাদে কর্মজীবন থেকে সরে যেতে হয়েছিল। আখতার ইমাম তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক, ধর্মীয় পশ্চাদময় প্রেক্ষাপটে ফজিলাতুন্নেসার মত একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমতী, কর্মদ্যোগী, শিক্ষিত ও একজন যথার্থ দেশপ্রেমী নারীর যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি বলা যায় যুগের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। ফজিলাতুন্নেসা। সেই সময় মৃত্যুর মুহূর্তে ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন অবহেলিত ও বিস্মৃত। যদিও আশির দশকের শেষের দিকে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের জন্য 'ফজিলাতুন্নেসা জোহা' হল প্রতিষ্ঠা করে ফজিলাতুন্নেসার অসামান্য অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি দানে কিছুটা হলেও উদ্যোগী হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। নাসিরুদ্দিন, মোহম্মদ, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ মিস ফজিলাতুন্নেসা, এম.এ. প্রকাশক, নূরজাহান বেগম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৬ ঢাকা পৃঃ ৫৮৪।

২। চক্রবর্তী, উত্তরা, ইতিহাসে নারী শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ্ বেথুন কলেজ, সম্পাদনাঃ সুপর্ণা গুপ্ত, পৃঃ ১০০-১০১।

৩। ইমাম, আখতার, ফজিলাতুন্নেসা এবং বাংলাদেশে নারীর উচ্চশিক্ষা ও অগ্রগতি, রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৪ পৃঃ ২২।